আলো পথ

এমএলই নিউজলেটার
একাদশ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬

অনতিবিলম্বে আদিবাসীদের জন্য মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু হোক

আগামী ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষাদান চালু করতে হলে চলতি বছরেই তাদের পাঠ্যবই ছাপাতে হবে। ইতিমধ্যে পাঁচটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিশুদের পাঠ্যবই তৈরির কাজ ৯০ শতাংশ শেষ হয়েছে। সদিচ্ছা থাকলে চলতি বছরের মধ্যেই বাকি কাজ শেষ করে পাঠ্যবই প্রকাশ করা সম্ভব। পাশাপাশি অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিশুদেরও তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদান নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানে আদিবাসীদের সংস্কৃতি রক্ষার কথা বলা হয়েছে। পার্বত্য শান্তি চুক্তির একটি ধারায়ও বলা হয়েছে, আদিবাসীরা তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার পাবে। এ চুক্তি বাস্তবায়নেও সরকারের পক্ষ থেকে গুরুত্ব দিয়ে এ কাজটি শেষ করতে হবে।

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, বৃহস্পতিবার সমকাল-গণসাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত 'আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা : নাগরিক সমাজের অভিমত' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। বক্তারা আদিবাসী মাতৃভাষায় পাঠদানের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট তৈরিরও প্রস্তাব করেছেন। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সহায়তায় আয়োজিত এ গোলটেবিলে অংশ নেন সংসদ সদস্য, শিক্ষাবিদ, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সদস্য, গণমাধ্যমকর্মীসহ বিশিষ্টজন। আলোচনা সঞ্চালনা করেন সমকালের নির্বাহী সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি ও গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ।

রাজধানীর তেজগাঁও শিল্প এলাকায় সমকাল কার্যালয়ে গোলটেবিল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন সংসদ সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা, অধ্যাপক শফি আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, এনসিটিবির সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম) ড. সরকার আবদুল মান্নান, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, সমকালের সহযোগী সম্পাদক অজয় দাশগুপ্ত, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর পরিচালক (পরিকল্পনা) আবুল কাশেম, সেভ দ্য চিলড্রেন-এর এ্যাডভাইজার (এডুকেশন) ম. হাবিবুর রহমান, ইউনেস্কো বাংলাদেশ-এর প্রোগ্রাম অফিসার শিরিন আক্তার, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পরিচালক (ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট) ডা. শামীম ইমাম, ব্র্যাকের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার তপন কুমার আচার্য, জাবারাং কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের নেতা মানিক সরেন, কালচারাল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির নেতা বাঁধন আরেং এবং সিপ্রাড-এর নির্বাহী পরিচালক অ্যালবার্ট মানকিন।

আলোচনায় 'মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা পরিস্থিতি : বর্তমানের বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সৌরভ সিকদার।

সূত্র : দৈনিক সমকাল

জাতিসংঘ হেডকোয়ার্টার্সে
আদিবাসী ভাষা সুরক্ষা ও বিকাশে আরো অধিক মনোযোগ প্রদানের জন্যে বিশেষজ্ঞ সভা

গত ১৯ থেকে ২১ জানুয়ারি ২০১৬ নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ হেডকোয়ার্টার্স-এ অনুষ্ঠিত হল আদিবাসী ভাষা সুরক্ষা ও বিকাশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ সভা। আদিবাসী ভাষাগুলোকে সুরক্ষা ও বিকাশের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক আহবান জানানোর লক্ষ্যে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯ জানুয়ারি ২০১৬ বিশেষজ্ঞ সভায় সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন জাতিসংঘ আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের চেয়ারপার্সন মিজ মেগান ডেভিস। অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান সোশ্যাল পলিসি এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিভিসনের পরিচালক মিজ ডানিয়েলা বাস। মঞ্চে আরো আসন গ্রহণ করেন জাতিসংঘ আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের চীফ মিজ চন্দ্রা রায়-হেনরিকসেন। স্থায়ী ফোরামের সচিবালয় কর্তৃক বিশ্বের আদিবাসীদের ভাষা পরিস্থিতি বিষয়ক উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচির শুভ সূচনা করা হয়। কর্ম অধিবেশনে মুখ্য আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এক্সপার্ট ম্যাকানিজম অন দ্য রাইটস অফ ইনডিজেনাস পিপলস (এমরিপ)-এর চেয়ারপার্সন মি. আলেক্সি সিকারেভ ও চিলির মাপুচে আদিবাসী জনগোষ্ঠী থেকে আসা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক এলিসা লনকন অ্যান্টিলিও। বিকেলের অধিবেশনে মুখ্য আলোচক ছিলেন হাওয়াইয়ান আদিবাসীদের মিডিয়া সহায়তা দানকারী সংস্থা মাকাউইলা'র নির্বাহী পরিচালক অ্যামি ডি কালিলি ও য়ুচি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রজেক্ট-এর নির্বাহী পরিচালক রিচার্ড এ গ্রাউন্ডস।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে মুখ্য আলোচক ছিলেন ইকুয়েডরের কিচুয়া আদিবাসী জনগোষ্ঠীর চলচ্চিত্রকার আলবার্টো মুয়েনালা, রাশিয়ার ইটেলমেন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর যুব প্রতিনিধি তাতিয়ানা ডেগাই এবং থিয়েরে ক্রানজার। দ্বিতীয় অধিবেশনে মুখ্য আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের জাবারাং কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা ও পেরু থেকে আসা সমাজবিজ্ঞানী ও ভাষাবিদ লুইস এনরিক লুপেজ। অধিবেশনে আদিবাসী ভাষাসমূহ রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তির অভিজ্ঞতা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় আদিবাসী ভাষা ব্যবহারের অভিজ্ঞতা, আদিবাসীদের ভাষায় পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা উপকরণ প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভালো উদাহরণ ও চ্যালেঞ্জ, আদিবাসী ভাষা প্রমিতকরণের ফলাফল ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

বিকেলের অধিবেশনে মুখ্য বক্তা ছিলেন অ্যান্নেট্টা বক ও গোগলস ইঞ্জিনিয়ার ক্রেইগ করনেলিউস। সম্মেলনের শেষ দিন আদিবাসী ভাষা বিকাশে ভবিষ্যত করণীয় বিষয়ে আলোচনা হয়। সম্মেলনে আসা বিশেষজ্ঞরা আদিবাসী ভাষাগুলোকে পুনর্জীবন, সুরক্ষা ও বিকাশের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে আদিবাসী ভাষা বিষয়ক একটি জাতিসংঘ দশক ও আন্তর্জাতিক দিবস ঘোষণার জন্য আহবান জানান। বিশেষ করে জাতিসংঘের বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান UNESCO কে এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার জন্য আহবান জানানো হয়।

সম্মেলনে উপস্থিত বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, বলিভিয়া, কানাডা, কলাম্বিয়া, ডেনমার্ক, এল সালভাদর, ফিনল্যান্ড, গুয়াতেমালা, মেক্সিকো, নিকারাগুয়া, নরওয়ে, নিউজিল্যান্ড, স্পেন ও পেরুর প্রতিনিধিরা এই সুপারিশমালা সমর্থন করে বিবৃতি প্রদান করেন। এই বিশেষজ্ঞ সভার সুপারিশ আগামী মে মাসে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘ আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের সভায় উপস্থাপন করা হবে।

জাতিসংঘ প্রেস রিলিজের বাংলা অনুবাদ

মায়ের ভাষায় লিখতে না পারার কষ্ট নিয়ে শহীদ মিনারে

নেপোলিয়ন তালুকদারের বাড়ি রাঙামাটিতে, বাড়িতে মা-বাবাকে নিয়ে পাঁচজনের পরিবারে তারা যখন কথা বলেন, তা মাতৃভাষা চাকমায়। কিন্তু মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগ হয়নি ঢাকার নটরডেম কলেজে পড়ুয়া এই পাহাড়ি শিক্ষার্থীর।

এই কষ্টটুকু বুকে নিয়েই ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিতে এসেছিলেন নেপোলিয়ন। ফুল দিয়ে অকপটেই নিজের মনোবেদনা বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকমের কাছে প্রকাশ ঘটান এই কিশোর- 'আমরা ঘরে চাকমা ভাষাতেই কথা বলি। চাকমাই আমাদের ভাষা। আমাদের পরিবার শিক্ষিত পরিবার। কিন্তু কেউই চাকমা ভাষায় লিখতে পারি না।' শহীদ মিনারে নেপোলিয়নের সঙ্গী অমর জীবন চাকমাও বলেন,'আমার মাতৃভাষা চাকমা। আমি সেই ভাষা লিখতে পারি না। অনেক কষ্ট লাগে, কিন্তু কিছু বলতে পারি না।'

১৬ কোটি মানুষের বাংলাদেশে দুই শতাংশের মতো বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষ রয়েছেন, যারা মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগ এখনও পাননি। এবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে জাতিসংঘের সংস্থা ইউনেস্কোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে যে ভাষা ব্যবহার করেন, তা তাদের বোধগম্য নয়। 'যদি তারা বুঝতেই না পারে, তাহলে তারা শিখবে কীভাবে?' এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কথাও রয়েছে, যাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন নেপোলিয়ন ও অমর। মায়ের ভাষায় কথা বলতে বাঙালির রক্ত দেওয়ার দিনটি যখন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিয়ে সারাবিশ্বের ভাষা-ভাষীদের অধিকার আদায়ের প্রতীক হিসেবে পালিত হচ্ছে, তাতে একাত্ম হন এই দুই কিশোর। নটরডেমে পড়ুয়া অমর জীবন বলেন, '১৯৫২ সালে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় এদেশের মানুষ প্রাণ দিয়েছে। আমরা আজ তাদের স্মরণ করছি এখানে এসে।'

'এর আগে আসতে পারিনি। খাগড়াছড়ি ছিলাম, এই কারণে আসতে পারিনি। এবার আসতে পারায় খুবই ভালো লাগছে।' প্রাথমিক, মাধ্যমিকের চৌকাঠ পেরিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে এলেও গ্রামের বাড়ি রাঙামাটিতে কিংবা বাবার কর্মসূত্রে খাগড়াছড়িতে পড়ার সময় কোনো বিদ্যালয়েই মাতৃভাষা শেখার সুযোগ হয়নি বলে জানান তিনি। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা তো শিখতে হবে, শিখবও। কিন্তু মায়ের ভাষা লিখতে না পারলে কষ্ট হয়।' সহপাঠী নেপোলিয়নেরও শহীদ মিনারে আসা এবারই প্রথম। তার ও পানখাইয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও খাগড়াছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সময় মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের কোনো সুযোগ ঘটেনি। নেপোলিয়ন বলেন, 'প্রত্যন্ত পাহাড়ে হয়ত কোথাও কোথাও চাকমা ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা আছে কিন্তু তাদের আবার আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। শহরে চাকমা জানা কাউকে দিয়ে লেখাটা শিখে নেওয়া যায় না।' শহীদ মিনারে অমর জীবন ও নেপোলিয়নের সঙ্গে ফুল দিতে উপস্থিত বাঙালি কিশোর চন্দন রায় চান, তার মতোই যেন মাতৃভাষায় পড়ার সুযোগটা হয় তার বন্ধুদের উত্তরসূরিদের।

'এই দিনে আমি চাই, আমি যেমন মায়ের ভাষা লিখতে পারি, আমার বন্ধুরাও যেন মায়ের ভাষা লিখতে পারে, লেখাটা শিখে নিতে পারে।'

সূত্র: বিডি নিউজ ২৪ ডটকম

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা সংস্কৃতির সমীক্ষা চলছে

দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য দেশব্যাপী চলছে সমীক্ষা। এ সমীক্ষা থেকে ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর অবস্থান ও সংখ্যার তথ্য যেমন মিলবে, তেমনি জানা যাবে ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নানামাত্রিক তথ্য। ঢাকায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট 'বাংলাদেশের নৃ-ভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা' শীর্ষক সমীক্ষা পরিচালনা করছে।

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভের প্রেক্ষাপটে স্থাপিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ২০১০ সালে যাত্রা শুরুর পর এটিই তাদের ব্যাপকভিত্তিক কার্যক্রম। ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী এ ব্যাপারে বলেন, ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণ মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অন্যতম কাজ। এ জন্য বাংলাদেশে কী কী ভাষা রয়েছে, সেসব ভাষায় কত সংখ্যক মানুষ কথা বলে এই সংক্রান্ত তথ্য জানাটা জরুরি। এসব তথ্য সংগ্রহের জন্যই একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হচ্ছে। সমীক্ষার তথ্যানুসারে হুমকির মুখে থাকা ভাষা সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এ সমীক্ষার আওতায় বাংলাদেশে অবস্থিত সব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, সম্প্রদায়, বর্ণ পেশাজীবী ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এ জন্য এই প্রথমবারের মতো দেশে গ্রামভিত্তিক সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। যেসব গ্রামে ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের বাস রয়েছে, সেখানে চলছে খানা জরিপ। এ জরিপের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী/সম্প্রদায়ের সংখ্যা, পরিচিতি, ভাষা, সংস্কৃতি, উৎসব, ঐতিহ্য ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। কেবল তাই নয়, জিপিএস ট্রাকিংয়ের মাধ্যমে বিশ্ব মানচিত্রে ওই গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থানও চিহ্নিত করা হচ্ছে।

দেশের সমতল অংশে এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার হাজার গ্রাম চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস রয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলে এ পর্যন্ত চিহ্নিত হয়েছে প্রায় তিন হাজার ৮০০ গ্রাম। এর বাইরে সারা দেশে প্রায় তিন হাজার গ্রাম পাওয়া গেছে, যেখানে বর্ণ পেশাজীবী কিংবা ধর্মীয় গোষ্ঠী রয়েছে।

সমীক্ষাটি শুরু হয়েছে ২০১৪ সালের জুন মাসে। আগামী জুনের মধ্যে তা শেষ হওয়ার কথা। ১১ জন ভাষা ও নৃবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞের অধীনে ২০ জন ফিল্ড সুপারভাইজার ও ১২০ জন গবেষণা সহকারী মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ করছেন।

প্রকল্পের ফেলো হাসিনা বেগম জানান, সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সমীক্ষাটি পরিচালিত হচ্ছে। অনলাইনে ডাটাবেইসও তৈরি করা আছে। মাঠ পর্যায় থেকে গবেষণা সহকারীরা তথ্য সংযুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তা কেন্দ্রীয় তথ্য-ব্যাংকে জমা হয়ে যাচ্ছে। তিনি জানান, দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা তথ্য আসছে। কিন্তু চূড়ান্ত তথ্য প্রকাশের আগে সংশ্লিষ্ট গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করা হবে। একই সঙ্গে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন, এ সমীক্ষার পর অনেক বিষয়ের ইতিহাসই নতুন করে বিন্যাস করতে হতে পারে।

আজিজুল পারভেজ

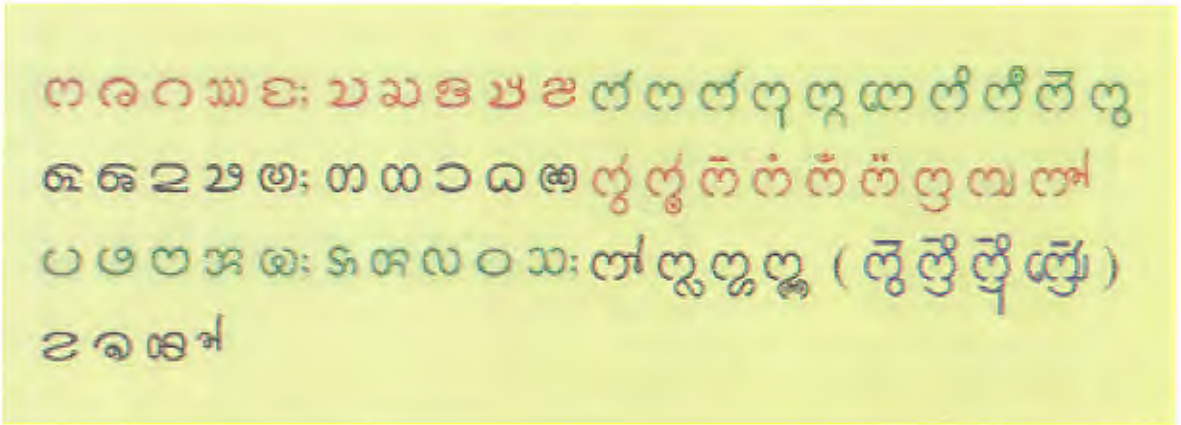

চাকমা লিপি

ঐতিহ্যবাহী মণিপুরী রাসমেলা

মণিপুরী পাঠ

পূর্ণিমারাস

মণিপুরীর হাবিৎত গজর কুমেইহান পুর্ণিমারাস। হারিবছর কার্তিক মাহার পূর্ণিমা তিথিৎ মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার মাধবপুর শিবাবাজারর জোড়ামাণ্ডপে যে মহারাসলীলা বারো রাখুয়াল অর, অর অহানরে তিলকরিয় একলগে পূর্ণিমারাস উৎসবহান বুলিয়া মাত্তারা। আদমপুরর মাংখেইমাঙর মাণ্ডপেউ পূর্ণিমার রাসলীলা অর।

জোড়ামাণ্ডপর পূর্ণিমারাস অহান আহৌ য়াঙ্গেই বছর লালুইল। উৎসব এহাৎ হাবিধর্মর লিশিং লিশিং মানু তিলুইতারা। বিয়ান বারোটার অগদে রাখুয়ালহান আরম্ভ অর। পইলা জোড়ামণ্ডপে, পরে অহাৎত শিববাজারর মেলাহার খুলা বি'ৎ অনুষ্ঠানহান নিতারাগা। তঙাল তিনগ মণ্ডলিৎ রাখুয়ালর ফিজেত হাজেলনো গোপালশৌ অতাই নাচানি অকরতাই। গুরু রাহানিৎ যিতেগা হুর্কাশৌ কৃষ্ণ বারো তার মারুপর মাতৌকৈথক খেলা অতা শৌরেউ হারৌ করের। য়েকনাপার লগে কৃষ্ণর ফাংনা অনার ভাবঅহান মানুর মনে সত্যব্রত আহার শিক্ষা দের।

মাদানে রাখুয়ালহান লমিলেউ সেন্দাৎত রাতি পেয়া মেলাহান থাইতই। রাতি বারোটাৎ আরম্ভ ইতই মহারাসহান। ১৭৬৯ সালে হপনে আদেশ পেয়া মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র মণিপুরে পইলা রাসলীলার ঠৌরাঙ করেছিল। কুঞ্জরাস, বসন্ত-রাস নিত্যরাস, মহারাস এসারে তঙাল তঙাল ভাবনো রাসলীলার প্রচলন আছে মণিপুরী সমাজে। কার্তিকী পুর্ণিমার মহারাস এহানরে হাবিৎত পুণ্যহান নিংকরতারা ভক্তজনে।

রাসলীলাৎ নাচতারা নিঙনশৌরে ব্রজগোপী বুলতারা। রাসলীলার প্রধান ভূমিকাৎ থাইতারা বৃন্দা, রাধা বারো কৃষ্ণ। রাসলীলার মণ্ডলিগ বৃন্দাবনর অনুষরণ করিয়া লতাপাতা বারো চে'নো হংকরা ফুলনো হাজিতারা। রাসধারী, সূত্রধারী বারো ডাখুলাগি কোনা আগৎ বহিতারা। নটকীর্তনহাননো রাসলীলা আরম্ভ অর। থাঙনাৎ সূত্রধারীর এলার রাগাগো। পরে বৃন্দাগই এলা নাচানো কৃষ্ণর চরণ-ধুলা পানার কাজে বৃন্দাবনহান হাজায়িতই। রাধা-কৃষ্ণর সাক্ষাৎ, অনুরাগ, অভিসার, মান, অভিমান, বিরহ এরে ভাবএতা ইলকরিয়া রাতি ফুনা পেয়া রাসহান চলতই।

রাতি ফুইলে রাসহানৌ লমর, কৃষ্ণর লগে অভিসারেৎত নুংশিপি রাধিকা নিজর গরে আলুইরি আহির পানিৎ তিঙে তিঙে, মানুয়ৌ গরে আলুইতারা। লমর পূর্নিমারাসর মেলহান।

অধ্যাপক রণজিত সিংহ

বাংলা পাঠ

রাসপূর্ণিমা

মণিপুরীদের সবচেয়ে বড় উৎসব রাসপূর্ণিমা। প্রতি বছর কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার মাধবপুর শিববাজারের জোড়ামণ্ডপে একসঙ্গে যে রাসলীলা ও রাখাল নৃত্য হয়, তাকেই রাস পূর্ণিমা উৎসব বলা হয়ে থাকে। আদমপুর বাজারের তেতইগাঁওয়ের মণ্ডপেও রাসলীলা উৎসব হয়ে থাকে।

জোড়ামণ্ডপের রাস-উৎসব দেড়শ' বছরেরও বেশি সময় ধরে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। এই উৎসবে স্থানীয় এবং দূর দূরান্ত থেকে আসা নানা ধর্মের হাজার হাজার লোক মিলিত হয়। দুপুর বারোটার দিকে শুরু হয় রাখাল নৃত্য। প্রথমে জোড়ামণ্ডপে, পরে সেখান থেকে শিববাজারের মেলার খোলা মাঠে অনুষ্ঠানটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন হয়।

পৃথক তিনটি মঞ্চে প্রথাগত পোশাকে রাখাল বালকেরা নাচতে শুরু করে। গরু চরাতে গিয়ে বালক কৃষ্ণ এবং তার রাখাল বন্ধুদের বিভিন্ন নৃত্য, ক্রীড়া এবং রাক্ষসবধের কাহিনী সকলকে আনন্দ দেয়। কৃষ্ণের সঙ্গে অসুরদের লড়াই মানুষকে জীবনের সত্য ব্রতের শিক্ষা দিয়ে থাকে।

বিকেলে রাখাল নৃত্য শেষ হলেও রাত-অবধি মেলা চলে। রাত বারোটা থেকে শুরু হয় রাসলীলা। ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র স্বপ্নে আদেশ পেয়ে মণিপুরে প্রথম রাসলীলার আয়োজন করেন। মণিপুরী সমাজে কুঞ্জরাস, বসন্তরাস, নিত্যরাস, মহারাস এরকম ভিন্ন ভিন্ন রাসলীলার প্রচলন আছে। কার্তিক পূর্ণিমার মহারাসকে ভক্তজনরা সবচেয়ে পুণ্যের কাজ বলে মনে করেন। রাসলীলায় যে সকল মেয়ে নাচে, তাদেরকে 'ব্রজগোপী' বলা হয়। এতে প্রধান ভূমিকায় থাকে বৃন্দা, রাধা ও কৃষ্ণ।

রাস লীলার মণ্ডপটি বৃন্দাবনের অনুসরণে লতাপাতা, কাগজের ফুল ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হয়। রাসধারী, সূত্রধারী এবং মৃদঙ্গবাদকরা এক কোণায় বসেন। নটপালা দিয়ে রাসলীলা শুরু হয়। পরে থাকে সূত্রধারীদের রাগালাপ। এরপর কৃষ্ণের চরণ-ধুলা পাওয়ার জন্য বৃন্দা গান-নৃত্য দিয়ে বৃন্দাবন সাজায়। রাধা-কৃষ্ণের সাক্ষাৎ, অনুরাগ, অভিসার, মান-অভিমান, বিরহ এসকল ভাব নিয়ে ভোর পর্যন্ত রাসলীলা চলে।

রাত পোহালে রাস শেষ হয়, কৃষ্ণের সঙ্গে অভিসার শেষে রাধা যেমন চোখের জলে ভিজে নিজ ঘরে ফিরে, তেমনি ফিরে যায় মানুষেরাও। শেষ হয় রাসপুর্ণিমার মিলনমেলা।

অনুবাদ : জ্যোতি সিনহা

পার্বত্য চট্টগ্রামে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের শিক্ষা কর্মসূচি

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) ২০০২ সাল হতে মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে আসছে। বর্তমানে এমজেএফ দেশের ১২২টি সংস্থাকে তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সহায়তা দিয়ে আসছে এবং প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান পরিবর্তনে জাতীয় পর্যায়ে এ্যাডভোকেসি করছে।

এমজেএফ ২০০৫ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম ও সুবিধাবঞ্চিত পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর জীবনমান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সেবা প্রদান ও অধিকারভিত্তিক বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে এমজেএফ ১৬টি সহযোগী এবং ৯টি সহ সহযোগী সংস্থাকে তাদের কর্মসূচি পরিচালনার জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন গত এক দশক ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম ও সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় অবস্থিত জনগোষ্ঠীর জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে মৌলিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করে আসছে। এ তিন জেলার মোট ১২ উপজেলার ৩৭টি ইউনিয়নে শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, পাংখোয়া, লুসাই, বম, ম্রো, খুমী, খিয়াং বাঙালিসহ মোট নয়টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ৩২,৪৪৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য মোট ৩৪০ টি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

এই শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো- প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা ও শিশু শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা, স্কুল পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত কমিটিসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করা ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে স্কুল স্থায়িত্বকরণে সক্ষমতা অর্জন করা এবং স্কুল নিবন্ধীকরণ/সরকারিকরণে স্কুল কমিটির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা। এ বিষয়ে কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

- স্কুল পরিচালনা কমিটি, মা দল, পিটিএ, যুব দলসহ বিভিন্ন স্কুল সংশ্লিষ্ট নানান দলকে কার্যকরী ভুমিকা পালনে প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান;
- বেসরকারি স্কুলগুলোতে শিক্ষকের চাহিদাপুরণ করা (বেতন প্রদান);
- সামাজিক উদ্যোগে স্কুল হোস্টেল পরিচালনার জন্য সহায়তা প্রদান;
- স্কুলে শিক্ষা উপকরণ প্রদান;
- স্কুল শিক্ষার মান উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি সহায়তা নিশ্চিতকরণ;
- বেসরকারি ও পিছিয়ে পড়া স্কুলগুলোর টেকসই উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচি পরিচালনা;
- মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করা;
- বার্ষিক খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান।

এছাড়াও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগণের লুপ্তপ্রায় বৈচিত্রময় ভাষা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে কাজ করছে।

ওয়াসিউর রহমান তন্ময়

নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে সুপারিশমালা

সরকারের গৃহীত নীতিগত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে বিদ্যমান নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষাকে অধিকতর হৃদয়ঙ্গম করা এবং ঝরে পড়া রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সুপারিশমালা প্রেরণ করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। নিচে সংক্ষিপ্তাকারে সুপারিশসমূহ উল্লেখ করা হল:

ক. যে সকল ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর নিজস্ব বর্ণমালা আছে সে সকল ভাষাভাষি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের জন্য বাংলা ভাষায় প্রণীত কারিকুলাম সংশ্লিষ্ট নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ভাষায় প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে;

খ. প্রাথমিকভাবে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণি বা যে শ্রেণি পর্যন্ত সরকার উপযুক্ত মনে করেন সে পর্যন্ত নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক থেকে সকল শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা ভাষা/নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ভাষায় এসআরএম প্রণয়ন করা যেতে পারে;

গ. ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণিতে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিশুরা দেশের অন্যান্য শিশুদের ন্যায় বাংলা ভার্সনের পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণিতে নিজস্ব ভাষায় প্রণীত এসআরএম অনুসরণ করবে;

ঘ. নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষায় পাঠ্যবই প্রণয়ন এবং এ সম্পর্কিত নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধির অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে;

ঙ. প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রণীত নতুন শিক্ষাক্রমের আওতায় প্রণয়নকৃত বাংলা পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গেই একযোগে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য নিজস্ব ভাষায় পাঠ্যবই প্রণয়ন করা যেতে পারে;

চ. নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদান এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সুপারিশ এবং সরকারকে দিক-নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ সরকারের সমন্বয়ে উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে;

ছ. নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকার বিদ্যালয়ে বিদ্যমান শিক্ষকদের সংশ্লিষ্ট ভাষায় শিক্ষা প্রদানে দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কতিপয় পিটিআই-তে 'বিশেষ প্রশিক্ষণের' ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ভাষার উপর দক্ষ ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়।

আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম : আমাদের করণীয় বিষয়ক আঞ্চলিক সেমিনার

গত ১৪ই মার্চ ২০১৬, সিলেটে সিলভার প্যালেস কনফারেন্স রুমে গণসাক্ষরতা অভিযান এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ (RDC)-এর সহযোগিতায় 'আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম : আমাদের করণীয়' শীর্ষক একটি আঞ্চলিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা (এমএলই) বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং গুরুত্ব অনুধাবন। সেই সাথে বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রমে আদিবাসী শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সকলের আগ্রহ বাড়ানো ও বাস্তবায়ন তরান্বিতকরণ। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, জেলা শিক্ষা অফিসার, সিলেট, অধ্যাপক ড. তুলসী কুমার দাশ, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব ইকরামুল কবির, সভাপতি, প্রেস ক্লাব, সিলেট।

দিনব্যাপী আঞ্চলিক সেমিনারে সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিবৃন্দসহ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। সেমিনার সঞ্চালনা করেন RDC-এর সাধারণ সম্পাদক জান্নাত-এ-ফেরদৌসি। এমএলই বিষয়ক উপর্যুক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ তুলে ধরেন-

- প্রথম পর্যায়ে সিলেট অঞ্চলের আদিবাসীদের ভাষায় বিশেষ করে মণিপুরী ভাষায় মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা যায়নি। দ্বিতীয় দফায় মণিপুরীসহ অন্যান্য ভাষা অধিভুক্ত করা প্রয়োজন।
- একটি অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত দল কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে জরিপ ও গবেষণার মাধ্যমে সারা দেশে আদিবাসীদের একটি ভাষাচিত্র তৈরি করা।
- প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের আওতায় সকল আদিবাসী শিশুকে নিয়ে আসা। এজন্য যে সব ভাষায় নিজস্ব বর্ণমালা আছে তাদের ক্ষেত্রে সেই বর্ণমালায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা। যাদের লিপি নেই তাদের প্রচলিত বা তাদের পছন্দের লিপিতে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা। আর যাদের এখনও লেখ্যরূপ নেই, তাদের জন্য দ্রুত লেখ্যরূপ সৃষ্টির প্রচেষ্টা গ্রহণ।
- সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন ভাষার অভিধান প্রণয়ন করা। সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেক ভাষার জন্য পৃথক অভিধান প্রণয়ন না করে একই ভাষা পরিবারভুক্ত কয়েকটি ভাষা মিলে এক-একটি অভিধান প্রণয়ন করা যেতে পারে। এতে করে এইসব ভাষার আন্তঃযোগাযোগের ক্ষেত্রটিও বিস্তৃত হবে।
- যে সমস্ত আদিবাসী এলাকায় পর্যাপ্ত স্কুল নেই, সেখানে স্কুল স্থাপন এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করে সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষী এলাকায় পদায়ন করা।
- আদিবাসী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন ও বিকাশে আরো নিবিড়ভাবে কাজ করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পৃথক একটি বিভাগ গঠন করা।

শাহ আলম

মুক্তিযোদ্ধা জ্যোতিপ্রভা লারমা

জ্যোতিপ্রভা লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিপ্লবী নারী। পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সহ-সভানেত্রী। শরণার্থী হিসেবে দীর্ঘদিন ভারতে কাটিয়েছেন। পিতা চিত্তকিশোর লারমা এবং মা শুভাশিনী দেওয়ানের তিন ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে সবার বড় তিনি। পার্বত্য জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা এবং জুম্ম জাতির সাহসী নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও জনসংহতি সমিতির বর্তমান সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমার বড় বোন। ১৯২৬ সালে রাঙ্গামাটির ছোট মহাফ্রম নামক একটি গ্রামে তাঁর জন্ম।

জ্যোতিপ্রভা লারমা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পানছড়িতে ছিলেন। খাগড়াছড়িতে তখন পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী এবং মিজোদের বিভিন্ন ধরনের তৎপরতায় ভীষণ অস্থির অবস্থা। তখন তাঁর বয়স অনেক কম ছিল। স্বামীকে বাধা দিয়েছিলেন সরকারি চাকরিতে যোগ না দেওয়ার জন্য। তিনি তখন কিছু বুঝতেন না। কোথায় কি হয়েছে এসবই শুধু লোকজন থেকে শুনতেন। মাঝে মাঝে লোকজন মুক্তিবাহিনীর কথা বলাবলি করত, তবে তিনি যেহেতু চাকমা এলাকায় বাস করতেন তাই এগুলো নিয়ে খুব বেশি চিন্তা-ভাবনা করেননি। সে সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালির সংখ্যা খুব কম ছিল। তবে শুনেছেন বিভিন্ন এলাকা থেকে মুক্তিবাহিনীর ছেলেমেয়েরা এসে এখানে আশ্রয় গ্রহণ করত, কেননা পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল তখন দুই পক্ষের জন্য একদিকে নিরাপদের, অন্যদিকে ভয়েরও। কেননা এই এলাকাতেই মিজোরা আস্তানা গাড়ে। এছাড়া এখানে পাকিস্তানিদের ট্রেনিং প্যারেডও হতো।

সেই সময় দেশ তো এত উন্নত ছিল না, তখন মানুষের মধ্য দিয়েই সব খবরাখবর আসত। তাঁরা এক ঝলক দেখেই বুঝতে পারত কারা মুক্তিবাহিনী আর কারা রাজাকার। জ্যোতিপ্রভা লারমা মুক্তিবাহিনী দেখলে এদিকে তাদের শত্রু আছে কি না বলে দিতেন। কোনো কোনো সময় তারা রাস্তাঘাটের দিক নির্দেশনা চাইতেন। জ্যোতিপ্রভা লারমা বলেন, যদি জানতাম সেদিকে রাজাকাররা রয়েছে, তাহলে তাদের সেদিকে না যাওয়ার জন্য বারণ করতাম। ঐ পথ দেখিয়ে দিতাম।

জ্যোতিপ্রভা লারমা বললেন, আমরা তো তখন খুব একটা বের হতাম না। মাঝে মাঝে বাজারে যেতাম, আর দেখতাম বাজারে অনেক লোকজন। তবে বেশির ভাগ মানুষই অচেনা। কেননা সেসময় গ্রামের মধ্যে সব মানুষ একে অপরের পরিচিত ছিল। একদিন রাতে হঠাৎ অনেক মুক্তিযোদ্ধা আমাদের বাড়িতে এলো। তাঁরা আমার কাছে খাবার চাইল। বলল, আমাদের একটু খাবার দেন। আমি তখন আমাদের ঘরে যে জুমের কলা এবং ভাত ছিল তা দিলাম। তারা সেটাই খেলো। সংখ্যায় চার-পাঁচ জন হবে। তারা খেতে খেতে প্রায় মধ্যরাত হয়ে গেল। তারপর আমি সাহস করে তাদের বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসলাম।

দেশ স্বাধীন হবার পর জ্যোতিপ্রভা জড়িয়ে পড়েন জনসংহতি সমিতির রাজনীতির সঙ্গে। ১৯৮৬ সালে পানছড়িতে শান্তিবাহিনী ও সেনাবাহিনীর এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর তিনি শরণার্থী হন। দীর্ঘদিন শরণার্থী হিসেবে থাকার পর তিনি ১৯৯৭ সালে শান্তিচুক্তি হওয়ার পর দেশে ফিরে আসেন। বর্তমানে জ্যোতিপ্রভা জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভানেত্রী।

সূত্র: ইন্টারনেট

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক এমএলই নিউজলেটার **পহর** নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকার মান উন্নয়নের জন্য মতামত প্রদান করতে সকলের প্রতি আহবান জানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে যে কোনো ধরনের মতামত **গণসাক্ষরতা অভিযান** - এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২, ৮১৪২০২৪-৫, ৯১৩০৪২৭
ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২, ৫৮১৫৭৯৭১
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org

European Union